গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

তুর্কী আক্রমণ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান শাসন কালকেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ নামে অভিহিত করা হয়। চর্যাপদের পর সুদীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য। এই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। তার মধ্যে একটি প্রধান সাহিত্য শাখা হল মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য বলতে আমরা মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক বিশেষ এক সাহিত্য শাখাকেই বুঝে থাকি। পঞ্চদশ শতকে দেবী মনসাকে নিয়ে রচিত হল মনসামঙ্গল কাব্য। কানা হরদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখের হাতে মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে জনপ্রিয় একটি ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

মনসামঙ্গল কাব্যের মতোই মধ্যযুগের আর একটি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য হল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। যার উদ্ভব মোটামুটি ষোড়শ শতকে। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা বর্তমান ছিল। যদিও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যা কিছু বিকাশ এবং প্রসার মূলত ষোড়শ শতাব্দীতেই আর এই শতকের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী তিনজন কবি হলেন – মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী। মানিক দত্ত উত্তরবঙ্গের তথা মালদহের কবি, দ্বিজ মাধব পূর্ববঙ্গের এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ তথা বর্ধমান জেলার কবি। একথা বলা বাহুল্য যে, পাঁচালী বা লোককথার ক্ষুদ্র গীতিকার আকারে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অনেকদিন থেকেই সমাজে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। ঘরের ব্রতকথা হিসেবেই বোধ হয় প্রথম দিকে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই ব্রতের কথাবস্তুই ক্রমে যথেষ্ঠ গৌরব

অর্জন করে। এক্ষেত্রে তিনবঙ্গের তিন কবি মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচ্য তিন কবি মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিন কবির কাব্যে দেবী চণ্ডীকে নিয়ে যেভাবে তাঁরা কাব্য নির্মাণ করেছেন বা অঙ্কন করেছেন তাতে এই তিন কবির চণ্ডী ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। এঁদের মধ্যে কেউ দেবীর লৌকিক রূপের উপর পৌরাণিক বিভিন্ন রূপের প্রলেপ দিয়ে দেবী চণ্ডীর প্রকৃত আদল গড়ার চেষ্টা করেছেন; কেউ দেবী চণ্ডীকে পুরাণ অপেক্ষা তান্ত্রিকতার বিভিন্ন রূপের প্রলেপ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। আবার কেউ পৌরাণিকতার পাশাপাশি লৌকিক রূপের সংমিশ্রণে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণ করেছেন। আমাদের লক্ষ তিন বঙ্গের তিন কবির কাব্যের তুলনামূলক পাঠ বিশ্লেষণ করে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ করা। এই তিনজন কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে ব্রতকথার সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে একে মঙ্গলকাব্যের রূপদানে কতটা সফল হয়েছেন, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেবী চণ্ডীর স্বরূপের এই ভিন্নতা, সেটিও আমাদের গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমি সমগ্র বিষয়টিকে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি --

প্রথম অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রাক্ পর্বে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ
দ্বিতীয় অধ্যায় : তিন বঙ্গের তিন কবির নাম পরিচয়
তৃতীয় অধ্যায় : তিন বঙ্গের তিন কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়
চতুর্থ অধ্যায় : মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ
পঞ্চম অধ্যায় : দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ
ষষ্ঠ অধ্যায় : মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ
সপ্তম অধ্যায় : তিন কবির সৃষ্ট দেবী চণ্ডীর স্বরূপের ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য
উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রাক্ পর্বে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির মূলেও রয়েছে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। মধ্যযুগের প্রথম দিকে বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ জীবনে তুর্কী অভিঘাতের যে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলার বুকে, সেই অভিঘাতেরই অন্যতম ফসল মঙ্গলকাব্য। এতদিন বাংলার সমাজজীবন উচ্চবর্ণ হিন্দু ও নিম্নবর্ণ হিন্দু – এই দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। তুর্কী আক্রমণে পুরানো সমাজ কাঠামো ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে রাষ্ট্রকাঠামো। এই অভিঘাতে এই দুই বর্ণের মধ্যে একটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমন্বয় স্থাপিত হয়। পরস্পর বিভেদ বিচ্ছেদ ও ঘৃণা পরিহার করে একটা পাশাপাশি সহাবস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয় এই সময়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের আরাধ্য লৌকিক দেব-দেবী ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসকে স্বীকার করে নিলেন। অন্যদিকে নিম্নবর্ণীয়েরা উচ্চবর্ণের পৌরাণিক দেব-দেবীকে ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ পেল। বহু অনার্য দেবতা আর্য দেব-দেবীদের পাশে নিজেদের স্থান করে নিলেন। নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতারা উচ্চবর্ণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করলেন। এতদিন লৌকিক স্তরের মানুষের দেবতারা পূজিত হতেন পথে-প্রান্তরে গাছের তলায়। তাঁরা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর ও ভক্ত বৎসল। এইসব দেব-দেবী এবার উপরের স্তর পর্যন্ত উঠে এলেন। উচ্চস্তরের ধর্মসাধনার বাহ্যিক রূপ নিম্নবর্ণের দেব-দেবীর উপর পড়ল। লৌকিক ও পৌরাণিক এক মিশ্র প্রকৃতির রূপ তৈরি হল। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও এইভাবে গড়ে ওঠে। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যকথা নিয়ে নানা গাল-গল্প কিংবদন্তী, ব্রতকথা আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেই ব্রত কথাগুলির চণ্ডী ভাবনার সঙ্গে পৌরাণিক ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে কবিরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবিরা বাংলার এই লৌকিক দেবীর শক্তি ও প্রতাপের লোকপ্রচলিত আখ্যানের উপর শাস্ত্র-পুরাণের প্রলেপ দিয়ে তাকে কাব্যে রূপায়িত করলেন। এইভাবে বাংলায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার ঐতিহ্য গড়ে উঠল, যা প্রায় চারশো বছর বাংলা সাহিত্যের প্রধান সাহিত্য

শাখা রূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে। এই অধ্যায়ে আমরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটের বিষয় এবং প্রাক্ পর্বে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তিন বঙ্গের তিন কবির নাম পরিচয়

মধ্যযুগের কবিদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা তাঁদের জীবনকথা সম্পর্কে আমরা অনেক সময়েই সুস্পষ্ট তথ্য জানতে পারিনা। অনেক ক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করে কিংবা আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের সম্পর্কে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় চেষ্টা করি। আসলে মধ্যযুগে দেবতাই মুখ্য, মানুষ সেখানে গৌণ। কবিরা তাই তাঁদের সম্পর্কে কখনোই সোচ্চার ভাবে কিছু বলতেন না, নিজেদের রচনা সম্পর্কেও খুব একটা কিছু বলতেন না। কাব্যের ভণিতাতে তাঁদের সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিন কবি মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যমধ্যে নিজেদের সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের মতামত পর্যালোচনা করে এই অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

তিন বঙ্গের তিন কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার তিন বঙ্গের তিন কবির – মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাঠ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তাঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন দিক থেকে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র সৃষ্টি এবং উপাদান

সংগ্রহ সব ক্ষেত্রেই নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমন মানিক দত্ত প্রথমেই সৃষ্টি পত্তন দিয়ে শুরু করেছেন। এই সৃষ্টির বর্ণনায় মানিক দত্ত আদ্যাদেবী ভবানীর সপ্তজন্মান্তর দেখিয়ে হিমালয় গৃহে শিবের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন এবং তারপরই এই দেবীকে উদ্দেশ্য করে গানের পালা আরম্ভ করেছেন। কাব্যকে অনেকখানি ব্রতকথার আঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন এবং মালদহ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রায় সব পুথিতেই মঙ্গলদৈত্য বধ কাহিনীর পরে আবার গণেশ বন্দনা করে রীতিমত কাব্যারম্ভ হয়েছে। তিনি পুরাণ অপেক্ষা তন্ত্রের দিকে বেশি জোর দিয়েছেন। সুনিপুণ পালাবিন্যাস এবং চরিত্র ও ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশে তাঁর কাব্য অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যকে বারংবার 'নৌতনমঙ্গল' অর্থাৎ নতুন ধরণের চণ্ডীমঙ্গল বলেছেন। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে তিনি বৈষ্ণব কবি ছিলেন না। কিন্তু তবুও বৈষ্ণব ভাব তাঁর কাব্যে একটু বিশেষ রসের সঞ্চার করেছে। এই অধ্যায়ে তিন বঙ্গের তিন কবির কাব্যের পরিচয় যথাযথভাবে তুলে ধরেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতবর্ষে শক্তিপুজা প্রচলিত। সর্বশক্তিমান দেবির এই স্বরূপ ও মহিমার কথা জানা যায় 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'-র অন্তর্গত 'চণ্ডীগ্রন্থ'-এ পাই দেবীর ঐশ্বর্যময়ী রূপকে। পরবর্তীকালে নানা লোকদেবতার রূপ মিশ্রিত হয়ে নানা মিশ্র রূপের কল্পনা করা হয়েছে। মানিক দত্তের কাব্যের দেবী চণ্ডী এই মিশ্র রূপেরই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি লৌকিক রূপের উপর পৌরাণিক বিভিন্ন রূপের প্রলেপ দিয়ে দেবী চণ্ডীর প্রকৃত আদল গড়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাব্যে দেবীর দশভুজা রূপের পাশাপাশি চতুর্ভুজা রূপের পরিচয় পাওয়া যায় খুল্লনা, শ্রীমন্ত, জয়া ও

সুশীলাকে নিয়ে স্বর্গারোহণের ঘটনায়। অনুমান করা যায়, নবম শতকে মালদায় দেবী চণ্ডীর যে চতুর্ভুজা মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্ত্তিই হয়তো কবিকে এরূপ বর্ণনায় প্রভাবিত করে থাকতে পারে। এই অধ্যায়ে মানিক দত্তের চণ্ডী ভাবনার সেই স্বরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ

পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে দেবী চণ্ডীর এক ভিন্ন স্বরূপ তুলে ধরেছেন। দ্বিজ মাধব পুরাণ অপেক্ষা তান্ত্রিকতার বিভিন্ন রূপের প্রলেপ দিয়ে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণ করেছেন। মূল কাহিনী শুরুর পূর্বেই কবি দেবীকে দিয়ে মঙ্গলদৈত্য বধ করিয়ে নিয়েছেন। এই চণ্ডী হলেন মঙ্গলচণ্ডী। অষ্ট-মাতৃকা ও ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃত হয়ে দেবী যেভাবে যুদ্ধ করেছেন তার সঙ্গে মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত চণ্ডিকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় কলিঙ্গ রাজা ও সিংহল রাজার সঙ্গে যুদ্ধে মঙ্গলচণ্ডীর যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেদিক থেকেও এই দেবী যেন মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিচ্ছবি। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর কাব্য পাঠ করে দেবী চণ্ডীর সেই স্বরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের দেবী চণ্ডী অভয়া নামে পরিচিত। কবি তাই তাঁর কাব্যকে অভয়ামঙ্গল বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যে দেবী অভয়ার পূর্ব ইতিহাসের পাশাপাশি মর্ত্যভূমিতে তাঁর পূজা প্রচারের কথা বর্ণিত হয়েছে। দেবী চণ্ডী তাঁর কাব্যে মঙ্গলময়ী, তিনি প্রাণীকুলের অভয়দাত্রী মঙ্গলচণ্ডী। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডী ভাবনার মূলে

বৌদ্ধ প্রভাবও ক্রিয়াশীল। তবে এই চণ্ডী বিন্ধ্যারণ্যবাসিনী, বৈদিক অরন্যাণীর দেবতা। দেবীর এ স্বরূপের কোন ইঙ্গিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে নেই। বণিক খণ্ডে দেবী অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে আগত এবং পুরাণে প্রথিত দেবী উমা হৈমবতী। এক কথায় পৌরাণিকতার পাশাপাশি লৌকিক রূপের সংমিশ্রণে কবি মুকুন্দ তাঁর কাব্যে দেবী চণ্ডীকে নির্মাণ করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেবী চণ্ডীর সেই স্বরূপ অনুসন্ধান করেছি।

সপ্তম অধ্যায়

তিন কবির সৃষ্ট দেবী চণ্ডীর স্বরূপের ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিন বঙ্গের তিন কবি মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের মধ্যে দেবী চণ্ডীর যে স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে, সেই স্বরূপের কোন ভিন্নতা আছে কিনা ও কোন দিক থেকে তাঁরা স্বতন্ত্র তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে তিন বঙ্গের তিন কবির (মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তী) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর যে পরিচয় পেয়েছি, তারই আলোকে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।